একক ১ ❐ আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান
১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার
১.৪ আধুনিক সমাজের চাহিদা
১.৫ সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা
১.৬ গ্রন্থাগারের পরিবর্তনশীল অবস্থা
১.৭ তথ্যনির্ভর সমাজ
১.৮ গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রসার
১.৯ ভবিষ্যতের ছবি
১.১০ অনুশীলনী
১.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

সমাজকে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগারের অছি। সমাজের আহ্বানেই গ্রন্থাগারকে সাড়া দিতে হয় এবং সমাজের কাছেই সে দায়বদ্ধ। কাজেই গ্রন্থাগার কী ছিল, কী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী হাতে পারে, তা বোঝার জন্য সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। বহু বছর আগে এক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক বলেছিলেন, "একটি গ্রন্থাগার গঠিত হয় গ্রন্থ, মেধা ও আবাস নিয়ে।" এর সাহায্যে যথাক্রমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মজুত গ্রন্থভাণ্ডার, কর্মী ও কর্মসংস্থানকে। তাঁর এই উক্তিটিকে ঠিক বুদ্ধিদীপ্ত বা জ্ঞানগর্ভ আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এগুলি ছাড়াও একটি চতুর্থ উপাদান থাকা অত্যন্ত জরুরি ঃ পাঠক। পাঠকের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগার গ্রন্থের সমাধিস্থল ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই শুধুমাত্র গ্রন্থ ও গ্রাফিক নথিপত্রের সমাহারকে আমরা গ্রন্থাগার বলতে পারি না। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র এইসব উপাদানের সংরক্ষণের এক স্থানবিশেষ হতে পারেনা। গ্রন্থাগার হল এক প্রতিষ্ঠান। এটি একটি পদ্ধতি, যা গ্রন্থ ও গ্রাফিক নথিপত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবহার সহজতর করে তোলে। গ্রন্থাগার হল ভাবনাচিন্তা করার এক সহৃদয় আবাস, যাকে সকলেই নিয়মিত ব্যবহার, উপভোগ ও সম্মান করতে পারে। যে সব মানুষ কৌতূহলী, যাঁদের মন সক্রিয় ও অনুসন্ধিৎসু, গ্রন্থাগার তাদের কাছে এক নিশ্চিত আশ্রয়। মানুষ কেন গ্রন্থাগারে আসেন, এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থাগারিকেরা বলে থাকেন যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেই তারা গ্রন্থাগারে আসেন। অথবা আসেন চিত্তবিনোদনের জন্য পড়াশোনা করতে বা সামাজিক মেলামেশার উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারের মূল চরিত্রটি অবশ্য পাল্টে যায়, যদি ওই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে মানুষ সেখানে আসেন তাদের অনিশ্চয়তা দূর করতে, বা পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা অর্জন করতে, বা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অথবা এমন কিছু খুঁজতে যাতে তাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়। সুতরাং, গ্রন্থাগার ব্যবহারের উদ্দেশ্য শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, সমস্যার সমাধানও বটে। তথ্য সংগ্রহ এখানে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু নয়, সমস্যা সমাধানের তা এক উপায় মাত্র।

কাজেই আধুনিক ধারণায় গ্রন্থাগার হল এক যুক্তিসম্মত, স্বাভাবিক পরীক্ষাগার, যেখানে তথ্য সংগ্রহ, সেগুলির একত্রীকরণ, এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তথ্য ব্যবস্থা ও বৌদ্ধিক অনুশীলনের সাহায্যে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে স্থান লাভ করা যায়। কোনো কোনো সময় ছোটখাট কাজকর্মে লিপ্ত হতে দেখা গেলে, গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য সাধারণত একই থাকে। সেই উদ্দেশ্যটি হল যোগাযোগের এক সঙ্গা হিসাবে কাজ করা, যার লক্ষ্য হল নথিভুক্ত জ্ঞান, ভাবনা ও চিন্তার সংরক্ষণ। এই ফলেই অতীত কথা বলতে পারে ভবিষ্যতের সাথে। ভবিষ্যতে স্থান, কাল পরিব্যাপ্ত করে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়ে উঠবে। আজকের দৃশ্য, শব্দ এমনকী স্বাদ ও গন্ধ ভবিষ্যতের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকবে আমাদের সন্তানসন্ততিদের ও তারও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

১.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, সর্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করতে ও সর্বজনীন প্রয়োজন মেটাতে একত্রে কর্মরত মানুষদের নিয়েই গঠিত হয় সমাজে। আধুনিক সমাজে মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়। যেমন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দৃষ্টি দেয় বিশ্বাস ও ঐক্যের দিকে, আবার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মধ্যে কিছু আনুষ্ঠানিক ও কিছু অলিখিত বিধিনিয়মের মাধ্যমে সমাজের ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আসলে সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক উপায়। অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির রূপ সমস্ত ধরনের সমাজে একইরকম হয় না। সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিধিনিয়মই এগুলির রূপ নির্ণয় করে। সমাজবিজ্ঞানের মতে, মূল্যবোধ হল সমাজের মানুষের অন্তর্গত কিছু দৃঢ় ধারণা, যা ঠিক করে দেয় কী ভালো বা কী মন্দ, কী কাম্য বা কী অকাম্য। এটি একটি মানদণ্ড, যার সাহায্যে নির্ধারণ করা হয় কী ধরনের আচরণ অনুমোদন করা যায় বা যায় না। আধুনিক সমাজ সাধারণত সাম্য, স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র, সাফল্য, বাস্তববাদের মতো মূল্যবোধগুলিকে গুরুত্ব দেয়। সমাজবিজ্ঞানের বিধিনিয়মগুলি আসলে সমাজের প্রতিটি সদস্যের আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে। মূল্যবোধ আমাদের জন্য এক সর্বজনীন ও সামগ্রিক পথনির্দেশিকা রচনা করে। অন্যদিকে, বিধিনিয়মগুলি ব্যক্তি মানুষের আচরণের ক্ষুদ্র দিকগুলিও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার আজ এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর সৃষ্টি যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ হিসাবে, যা সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য আবশ্যক। সত্যি কথা বলতে কী, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কোনরকম গ্রাফিক নথি না থাকলে বা তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে কোনো সংস্কৃতি স্থায়ী হতে পারে না। গ্রন্থাগার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে সুনিশ্চিত করে ও বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে। একথা সত্যি যে আগেকার দিনে গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করত না। কারণ, সেই সময় গ্রন্থাগার ছিল কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গ্রন্থ সংগ্রহ রাখা থাকত তালাবন্ধ আলমারির ভিতর। প্রাচীনকালে গ্রন্থ লেখা হত হস্তাক্ষরে এবং তার সীমিত সংখ্যক প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব হত। পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি প্রতিলিপি তৈরি করা ছিল এক দুঃসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। কাজেই, প্রতিলিপি তৈরি ও সেগুলির নিরাপদ

সংরক্ষণের ব্যয়ভার বহন করা ক্ষমতা ছিল শুধুমাত্র রাজরাজড়া ও ধনী জমিদারদের। রাজারাজড়া ও জমিদারেরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই গ্রন্থাগার চালু রাখতেন।

বহু শতাব্দী ধরে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই ছিল নিজস্ব মালিকানাধীন। সেগুলি হয়তো ছিল কোনো বিদ্বান মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি বা কোনো ধনী মানুষের নিজস্ব সংগ্রহ। ধনী মানুষেরা গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পছন্দ করতেন, কারণ সেগুলি ছিল তাদের ঐশ্বর্যের চিহ্ন। প্রাচীন মঠগুলির সংগ্রহ এবং নালন্দা ও বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে সম্ভবত প্রথম "প্রতিষ্ঠান" হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ মঠগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার অবধারিতভাবে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির এক অঙ্গ ছিল। মুঘল আমলে রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থাগার তৈরি হয়—কোনো কোনো সময় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরগুলিতে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে প্রথম দিকের ইউরোপীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করতেন মিশনারীরা। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন মানুষের বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসাকে এক নতুন প্রেরণা জোগায়, যা আধুনিক যুগের স্বাধীন চিন্তা, শিক্ষা ও আত্মবিকাশের এক পূর্বলক্ষণ।

'প্রতিষ্ঠান' বলতে এখন পরোক্ষভাবে সংস্থা ও কার্যালয় বা ভবন, দুইয়েরই স্থায়িত্ব বোঝানো হয়। আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে থাকি যে, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থায়ী স্বীকৃতি পেতে চলেছেন। এছাড়াও কোনো প্রতিষ্ঠানই বারংবার, দ্রুত এবং মৌলিকভাবে নিজের পরিবর্তন ঘটায় না। বহু প্রজন্ম ধরে তাদের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রাখতে হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার সামাজিক প্রগতির কোনো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়, যার কোনো বিশেষ স্তর ও বিশেষ কর্তব্য আছে। গ্রন্থাগারের প্রকৃত রূপ ও উদ্দেশ্য প্রথম যুগে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট থাকলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে 'সামাজিক' শব্দটি মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। এইসব ধারণাগুলিকে একটি স্থায়ী রূপ দিতেই হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর গুণীজনেরা গ্রন্থাগারকে এক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। একবার গড়ে ওঠার পর সেগুলিকে ভেঙে দেওয়ার কোনো চিন্তাকেই আর প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। সাক্ষরতা ও শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে তারা সভ্য সমাজের কাঠামোর এক অপরিহার্য অঙ্গ। হাসপাতাল যেমন আমাদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয়, অনেকটা সেরকমই। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার সামাজিক প্রগতির কোনো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত—তা সামগ্রিক বিকাশের এক আবশ্যিক অঙ্গ। সমাজ নানা রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এইসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষকে সমাজের অঙ্গ করে তোলে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সমাজের কোনো-না-কোনো প্রয়োজন মেটায়। গ্রন্থাগারের সৃষ্টি সমাজের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

১.৪ আধুনিক সমাজের চাহিদা

আধুনিক সমাজের চাহিদা নানা রকমের, যাদের মধ্যে শিক্ষা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা একজন জ্ঞানসম্পন্ন, ওয়াকিবহাল, দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করতে সাহায্য করে, যাদের ছাড়া সমাজকে প্রগতি ও বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমাজ আশা করে যে তার সদস্যরা হবে সংযমী, জ্ঞানী, দয়ালু এবং প্রেম সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা সমাজের এক মৌলিক চাহিদা। এর জন্য সমাজের প্রয়োজন প্রযুক্তিগত উন্নতি, যার জন্য প্রয়োজন জরুরি গবেষণা ও উপযুক্ত তথ্যভাণ্ডার। আধুনিক সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল উন্নত প্রযুক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা এবং উন্নততর জ্ঞান।

"মানুষ শুধুমাত্র রুটির সাহায্যে বাঁচে না।" মানুষের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিগুলি তার জীবনধারাকে পরিশুদ্ধ করে এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেয়। ইতিহাসের উষাকাল থেকে অবকাশ যাপনের বিলাসিতা শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ধনী ও ক্ষমতাশীল মানুষেরা এই অবকাশ অর্জন করতে পেরেছিলেন, কারণ দরিদ্র ও দুর্বল মানুষেরা তাদের জীবনভর শ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রম থেকে মুক্তি স্বাধীনতার অন্যতম কাঙ্ক্ষিত রূপ। আধুনিক সমাজ এই রূপ আর দৃষ্টির নাগালের বাইরে নয়। এই রূপ এখন শুধু সেই সব ধনীদের জন্য নয়, যারা যন্ত্রের মালিক। এখন এই রূপ সবার জন্য, এমনকী যারা যন্ত্র চালায় তাদের জন্যও।

বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন রকম প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারের প্রসারের মধ্যে উন্নত সমাজগুলিতে ঘটে যাওয়া শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল তথ্যের দ্রুত নাগাল পাওয়ার দাবির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির অভ্যুত্থান। গবেষণামূলক কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার, সরকার এবং ব্যবসা ও শিল্পমহলকে কাজকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যের গুরুত্বকে নতুন করে উপলব্ধি করতে বাধ্য করাচ্ছে। সমাজে তথ্যের বাড়তি চাহিদা ছোট, বড় ও অত্যন্ত বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারকে প্রভাবিত করছে এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রদবদল করা হচ্ছে। পরিকল্পনা করা হচ্ছে এক ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু গ্রন্থাগারের সম্পদগুলিকে সংযুক্ত করতে পারবে।

এটা লক্ষ করা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজের যেসব প্রাথমিক প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলি মেটায়, যেমন শিক্ষা, গবেষণা, তথ্য, নান্দনিক উপলব্ধি, বিনোদন—এগুলি সবই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থাগারই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা সভ্যতার সমস্ত স্মারকের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে। যে সমাজে শিল্পায়নের মাত্রা বেশ উঁচু, সেখানে জ্ঞান এবং নিঁখুত ও সময়োচিত তথ্যের চাহিদা প্রায় সীমাহীন। আর সমগ্র বিশ্বজুড়ে যখন দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, গ্রন্থাগারের চাহিদাও হয়ে উঠেছে প্রায় সীমাহীন।

আধুনিক সমাজে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের আরও বেশি বৈচিত্র্যময়, স্বাধীন ও উচ্চশিক্ষিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন সামাজিক চেতনা। অতীতের চেয়ে অনেক বেশি করে আধুনিক সমাজ এখন ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার এবং তার সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলার প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কোনো ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে সমাজের এই বিপুল প্রত্যাশার কথা আমরা যখন চিন্তা করি, তখনই আমরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজে গ্রন্থাগারের পূর্ণ সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করতে পারি।

১.৫ সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজে গ্রন্থাগার সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যা বলে থাকি, তার সিংহভাগই সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রযোজ্য। সমাজে গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রশ্নগুলি এই সমস্ত বিষয় ছুঁয়ে যেতে পারে—অন্যান্য জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যমের তুলনায় পড়ার গুরুত্ব, বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারের শিক্ষার তুলনা, নিরক্ষরতার সঙ্গে চিরকালীন সংঘাত, গবেষণায় উৎসাহদান ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা, ব্যক্তির নান্দনিক উপলব্ধি, তথ্যের প্রচার ইত্যাদি। আধুনিক সমাজের ধারণায় গ্রন্থাগার কীভাবে এত শক্তি জমি পেল, সেটাই আমাদের এখন অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

১. শিক্ষা : সমাজের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণশৈলীকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তর করাকে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক সমাজে এই কাজ সম্পন্ন হয় প্রথাগতভাবে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—যে-কোনো-রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার থাকা উচিত। সমাজ শিক্ষিত মানুষদের চায়, কারণ তারাই ভবিষ্যতে হয়ে ওঠে উত্তম নাগরিক।

শিক্ষার দ্রুত এবং ধারাবাহিক বিকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগকে সভ্যতার পূর্ববর্তী যুগগুলি থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলির মূল্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাফিক উপাদানে নথিবদ্ধ জ্ঞানকে সকলের নাগালে এনে সামাজিক জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তোলার পিছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আমরা স্বীকার করি। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগার তার সুসম্বদ্ধ সংগ্রহের মাধ্যমে পাঠক্রম তৈরি করতে সাহায্য করে। সে শিক্ষক ও ছাত্র, উভয়ের প্রয়োজনকেই স্বীকৃতি দেয়।

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন, তাহলে সেটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আজীবন তার বৌদ্ধিক ক্ষুধা মেটানোর কাজটি গ্রন্থাগার অবশ্যই করে যাবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই কাজ করার জন্য গ্রন্থাগারই উপযুক্ত। এখন বিশ্বজুড়ে এক 'আজীবন শিক্ষা' অভিযান চলছে। অর্থাৎ, ধার দিয়ে যেমন ছুরিকে শানিত রাখা হয়, সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে তার সদস্যদেরও তেমন নিজেদের পেশাদারী ও বৃত্তিগত দক্ষতা বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের আত্মোন্নতির দায়িত্ব গ্রন্থাগারকে ভাগ করে নিতে হবে।

আজীবন প্রত্যেকটি মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষুধা মেটানো গ্রন্থাগারের কর্তব্য। একথা শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত, উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। আবার স্বাক্ষর ও নিরক্ষরের ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি করে সত্য। গ্রন্থাগার যদি মানুষের সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে চলমান রাখতে চায়, তাহলে তার প্রধান কর্তব্য হল সমাজের প্রতিটি সদস্যকে শিক্ষিত করে তোলা। সমাজের একজন নিরক্ষর মানুষও শিক্ষার সুফল ভোগ করতে সক্ষম। তথ্য সংগ্রহ, প্রদর্শন ও রূপান্তরের বহুবিধ প্রণালী এখন আধুনিক প্রযুক্তির করায়ত্ত। ফোটোগ্রাফি, ফিল্ম ও টেলিভিশন গত এক শতকের মধ্যে চিত্রিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের এক সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি আমাদের উপহার দিয়েছে। গ্রন্থাগারের (বিশেষ করে জনগ্রন্থাগারের) দায়িত্ব হল ফিল্ম, অডিও-ভিসুয়াল এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সাহায্যে সমাজের নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের এক অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার মানুষের শিক্ষা, কর্ম ও বিনোদনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রন্থাগার এমন একটি জায়গা যেখানে তাদের জ্ঞানের অন্বেষণ তাদের নিজস্ব শ্রেণিকক্ষ, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকদের দেওয়া শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সেগুলিকে অতিক্রম করে উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যায়। গ্রন্থাগারের মধ্যেই লেখক ও পাঠক, উভয়েই তথ্য, শিক্ষা ও আনন্দ নিতে একসাথে মিলিত হন। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব শুধুমাত্র কোনো বিষয়ের পটভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সামগ্রিক শিক্ষার আবশ্যক অঙ্গ যে অপ্রথাগত, শিক্ষায়তনের পাঠক্রম বহির্ভূত শিক্ষা, তার দায়িত্বও গ্রন্থাগারকে নিতে হবে।

২. সংস্কৃতি : যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের চিরাচরিত ভূমিকা হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ও প্রচার। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখবার কোন শক্তি না থাকলে সমাজ কাজ করতে পারে না। এই ঐক্যসাধনকারী শক্তিকেই নৃতত্ত্ববিদেরা সংস্কৃতি বলেন। আবিষ্কার, শিল্প, ধারণা, বিশ্বাসের মতো মানবচরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঘিরে রয়েছে এই সংস্কৃতি।

সাধারণ মানুষের মতে, গ্রন্থাগারের কর্তব্য হল গ্রাফিক নথিগুলি সকলের কাছে তুলে ধরা, যার ফলে ব্যক্তিমানুষের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ও তার নান্দনিক উপলব্ধি বিকাশ ঘটবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলাও গ্রন্থাগারের কর্তব্য হওয়া উচিত।

৩. গবেষণা : গবেষণা জ্ঞানের সীমারেখাকে প্রসারিত করে। তার নিজের অস্তিত্বকে ও চারপাশের পৃথিবীটাকে আরো ভালোভাবে বোঝার বাসনা মানুষকে বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে। এই বাসনা কিছুটা পরিতৃপ্ত হয় মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, সেগুলিকে এক সাধারণ সূত্রে বেঁধে ফেলা ও তাদের যুক্তিসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের বিস্তারের আরও কার্যকরী উপায় অবশ্য এক পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া—যাকে গবেষণা আখ্যা দেওয়া হয়।

সমাজের বাহ্যিক ও সাংস্কৃতির প্রগতি, দুই-ই গবেষণার উপর নির্ভরশীল। গবেষণাই হল সেই উপাদান, যা সমাজে জীবন সঞ্চার করে। গবেষণা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা গ্রন্থাগারের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। উপলব্ধ জ্ঞান ও তথ্যের নাগাল পাওয়া গবেষণার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, পেটেন্ট, সভা বিবরণী ও অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকে। গবেষণা প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য গ্রন্থাগারের উচিত এগুলি প্রকাশনা করা। গবেষণার অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগার বেশ কয়েকটি পরিষেবা দিয়ে থাকে। কয়েকটি প্রাথমিক পরিষেবা হল :

(ক) বিশেষ ধরনের রেফারেন্স ফাইল ও নির্ঘণ্ট রাখা

(খ) মুদ্রিত রচনার সন্ধান করা

(গ) সন্ধানকারীদের নির্ভুল, প্রাসঙ্গিক ও প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা

(ঘ) গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা

(ঙ) প্রয়োজনী প্রকাশনাগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করা

(চ) রেফারাল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা

(ছ) গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব সম্পদকে আরো প্রসারিত করে তোলা।

তথ্য : বস্তু ও শক্তির মতো তথ্য সমাজের এক মৌলিক সম্পদ। এই সম্পদের সাহায্যেই আমরা পরিবর্তিত ও উন্নততর করতে পারি। যুগ যুগ ধরে তথ্য মানুষের মনের ভিতর সঞ্চিত থেকেছে এবং পরবর্তীকালে সামাজিক সংস্পর্শ ও যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে। সমাজ যত উন্নত ও জটিল হয়েছে, তথ্যের উৎপাদন, প্রকাশনা ও প্রচার তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ঘটে গেছে এক "তথ্য বিস্ফোরণ"। এর সাথে সাথে, সাক্ষরতা প্রসার ও তথ্যের ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বের জন্য তথ্যসন্ধানী মানুষের সংখ্যাও নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য নিরক্ষরতা, দারিদ্র, সঠিক চেতনার অভাবের জন্য তথ্য থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে উঠেছে। তথ্য বিস্ফোরণ, তথ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, তথ্যের বাড়তে থাকা গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত জ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার চিরকালই তথ্যজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কিন্তু দেখা গেছে তার ঝোঁক প্রায়শই প্রথাগত পাঠের দিকে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এক অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠা। এখন গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের চিরাচরিত রীতিনীতিগুলি এখন তথ্য- কেন্দ্রকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে—যা ব্যবহারকারীর সঙ্গে তথ্য ব্যবস্থার সম্পর্কের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র এখন তথ্য-কারবারিদের মঞ্চ। যাদের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তারা সর্বদাই

তথ্যের খোঁজ করেন। উচ্চপদস্থ চাকুরীজীবী, ক্ষেতের কৃষক, কারখানার শ্রমিক—সকলের প্রয়োজন তথ্যের। কোনো নতুন সামগ্রী বাজারে ছাড়ার সময়, ক্ষেতে চাষবাদের সময় অথবা কোনো বহুতল বাড়ি তৈরির সময় সকলেই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অবস্থা এবং তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হতে চায়। সমাজের সকলেই বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের উত্তর চায় ; নিজের নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে তথ্যের সাহায্য নিয়ে তারা নিজেদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিতে চায়।

বিনোদন, প্রেরণা ও অবকাশ : জমিকে উর্বর করতে বাঁধ যেমন লক্ষ লক্ষ গ্যালন জমানো জল খালগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দেয়, গ্রন্থাগার তেমনই তার বিপুল সম্পদ মানুষের বিনোদন, প্রেরণা, শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য তার বিভিন্ন শাখার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। প্রতিটি মানুষ যাতে এক সুস্থ, উন্নত রুচির অবকাশ যাপন করতে পারে, সেটুকু সুনিশ্চিত করা গ্রন্থাগারের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, সুস্থ অবকাশ যাপন আমাদের সমাজজীবনে এক গভীর চিন্তার বিষয়। কাজেই, অবকাশের সময়টুকু যাতে কোনো নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে ব্যবহৃত না হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। ক্লান্ত, বিরক্ত মানুষ তার ক্ষুদ্র, নীরস পৃথিবী থেকে মুক্তি পেতে উত্তেজনা ও দুঃসাহসিক অভিযানের এক কাল্পনিক জগতে নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে রঙ্গানাথনের মতামতকে স্মরণ করা যেতে পারে : "বিনামূল্যে গ্রন্থ, চিত্র, সাউন্ড রেকর্ড ও অন্যান্য উপাদান বিতরণ করে এক উচ্চ রুচির, স্বনির্ভর অবকাশ যাপন সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সমাজের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক জাগরণের সুযোগ বাড়াতে হবে।" মানুষের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাতে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কিছু নমুনা সংগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের একথা স্মরণ করাই যথেষ্ট যে গ্রন্থাগারের প্রাথমিক চিন্তার বিষয় শেষ বিচারে মানবিক। আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেইসব মানুষদের সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানা যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন ও করেন না, ব্যবহার করলে কেন করেন এবং তাদের প্রয়োজনে আমরা কীভাবে সাড়া দিতে পারি। সমাজের সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র গ্রন্থাগার হল কোনোরকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আনুগত্যের ঊর্ধ্বে। অবশ্য কোনো বিবাদমূলক পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়লে গ্রন্থাগারকে কখনো কখনো বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে নজর দিতে হয়।

কিন্তু সমাজের অঙ্গীভূত এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারকে আবার সমন্বয় সাধনকারীর ভূমিকাও নিতে হয়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে, গোষ্ঠীস্বার্থকে নতুন ব্যাখ্যার সাহায্যে নতুন দিকে পরিচালনা করে গ্রন্থাগারের কর্তব্য সামাজিক ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা করা।

১.৬ গ্রন্থাগারের পরিবর্তনশীল অবস্থা

"গ্রন্থাগার আমাদের সাংস্কৃতিক অতীতের এক সজীব ভাণ্ডার, যা ভবিষ্যতের পূর্বানুমান করতে সক্ষম।" এই উক্তি তাঁর "সোশিওলজিকাল অ্যান্ড ইন্সটিটিউশান চেঞ্জেস ইন আমেরিকান লাইফ" শীর্ষক নিবন্ধে র‍্যালফ ডবল্যু কোনান্টের। (এ এল এ বুলেটিন, ১৯৬৪, ৫৮, ৯৯৪) জ্ঞানের সংরক্ষণ গ্রন্থাগারের এক মৌলিক দায়িত্ব। ইভেন শেরা বলেন যে কিছু কিছু গ্রন্থাগারিক এখনো গ্রন্থকে জড় বস্তুর মতো সংরক্ষিত করাকেই তাদের কর্ম- দক্ষতার মহত্তম প্রকাশ বলে মনে করেন। গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে অবশ্যই যে-র সাথে গড়ে তুলতে ও সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সেই কাজটি করতে হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের উপকারের জন্য—নিজস্ব সম্মান বাড়ানোর জন্য বা শুধু কিছু করার জন্য করা নয়। নথিপত্রকে যত বেশি সম্ভব ব্যবহার করতে হবে এবং তা করতে হবে কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই।

যে পরিস্থিতিতে আজকের গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে, তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বার্তা কোডিং, সঞ্চয় বিতরণের পদ্ধতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে ও চিরাচরিত গ্রন্থাগারগুলি এই সব বার্তার এক ক্ষুদ্র অংশকেই সামাল দিচ্ছে। গ্রন্থাগারের অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য, কারণ সে সমাজের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির স্মৃতি। আদিযুগের সেইসব মৃত্তিকা ফলকের উত্তরসূরি, আজকের এই গ্রন্থাগারকে এক বিশাল সামাজিক মেধা বলা যায়। সেই সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার পরিবেশের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তিন হাজার বছর ধরে চলে আসা মৃত্তিকা ফলক থেকে মুদ্রিত গ্রন্থে উত্তরণের প্রগতির সেই রেখা আজ ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। আজকের গ্রন্থাগারে যে সামাজিক মেধা সঞ্চিত রয়েছে, তার পরিমাণ সুবিশাল। এই ক্ষেত্রে চিরাচরিত ব্যবস্থা আর কার্যকরী হচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই, জ্ঞান সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধারের যে উন্নততর প্রণালী সম্প্রতি নতুন প্রযুক্তি আমাদের উপহার দিয়েছে, তাকে আমরা বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আর যাই হোক গ্রন্থাগার এখন যে অবস্থায় আছে তা চলতে পারে না। তথ্যপ্রযুক্তি হল কমপিউটার, যা তথ্য সঞ্চয় ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে এবং টেলিযোগাযোগ, যা বিশ্বের যে-কোনো মানুষকে যে-কোনো জায়গায় তথ্য পাঠাতে পারে—এই দুইয়ের এক শক্তিশালী মিলন।

১.৭ তথ্যনির্ভর সমাজ

আধুনিক সমাজে এখন বৈদ্যুতিন যোগাযোগের যুগ, যা গ্রন্থাগারের ভূমিকায় পরিবর্তন আনছে। আসলে আধুনিক সমাজ ক্রমশ এক তথ্যনির্ভর সমাজে পরিণত হবার দিকে এগিয়ে চলেছে। এটি এমন এক সমাজ, যেখানে জীবনের মান, সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিকাশ আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তথ্য এবং তার উপযুক্ত ব্যবহারের উপর। এখানে জীবনযাত্রার মান, কাজ ও অবকাশের ধরন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং বাজার সবকিছুকেই তথ্য ও জ্ঞানের অগ্রগতি প্রভাবিত করে। তথ্যকে সঠিকভাবে করতে সমর্থ হওয়ার স্তরে পৌঁছতে গেলে, অর্থাৎ তথ্য সৃষ্টি, তার অবস্থান নির্ণয়, ব্যবহার ও বিতরণ করতে গেলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতাকে বিশেষ তথ্যের ছাঁচে ফেলে নিতে হবে। সমাজে কাজ করার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে তথ্যপ্রযুক্তির নতুন একগুচ্ছ প্রণালী শিখে নিতে হবে—অর্থাৎ তার সাক্ষরতার অর্থ সমাজে তথ্যের ভূমিকা ও শক্তি, তার ব্যবহার ও অপব্যবহারকে উপলব্ধি করা এবং তথ্য সংগঠনের প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করা।

১.৮ গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রসার

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে গ্রন্থাগার আসলে এক তথ্যকেন্দ্র। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রকৃতি ও কাজের পরিধির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারগুলির আরও উন্নতি হয়েছে। গ্রন্থাগারের কাছে পরিবর্তন কোনো নতুন ঘটনা নয়। অতীতে পরিবর্তন যখন হওয়ার ছিল, তখন হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলির এত বেশি হারে উদ্ভব হচ্ছে যে, পরিবর্তনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সামাল দিতে হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ব্যাপকতা অতীতে যে-কোনো সময়ের থেকে ভিন্ন। এই পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক বা বিবর্তনমূলক—যাই বলা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। আসল প্রশ্নটি হল এই যে, এই ধরনের পরিবর্তন সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে কতখানি প্রভাবিত করবে।

অডিও-ভিসুয়াল, টেলিভিশন, মাইক্রোফিল্ম, কমপিউটার যোগাযোগ ইত্যাদি নতুন মাধ্যমগুলি গ্রন্থকে প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করিয়েছে। তথ্য উৎপাদন এত দ্রুতগতিতে হচ্ছে যে, গ্রন্থাগার তা সঞ্চয় ও সংগঠিত করে উঠতে পারছে না। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি তথ্য ব্যবসায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ক্যাটলগের জায়গা নিচ্ছে ডাটাবেস। যোগাযোগ চ্যানেলগুলি আরও বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তথ্য পরিবেশন করছে। আসলে, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির দরুন পরিবর্তনের গতি এত বৃদ্ধি পেয়েছে, যে গ্রন্থাগার পরিষেবার উপর এর সম্ভাব্য অনুমান করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সময়ে গ্রন্থাগারগুলি এক বিশাল, স্বনির্ভর সংগ্রহ রাখার চেষ্টা করত। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক বিচারে এই উদ্দেশ্য অবাস্তব। কারণ, "তথ্য বিস্ফোরণ" এখনো স্তিমিত হয়ে যায়নি। ফিলম্, মাইক্রোফিলম্, কমপিউটার টেপ, ভিডিও টেপ, সিডি-রমের মতো গ্রন্থ, জার্নাল, কারিগরি প্রতিবেদন, সভা বিবরণী ইত্যাদিতে তথ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। গ্রন্থাগার একদিন স্বনির্ভর হয়ে উঠবে, এই মহান স্বপ্ন আর বাস্তবোচিত নয়। এখন তার জায়গা নিয়েছে নেটওয়ার্কের ধারণা, যাতে গ্রন্থাগারগুলি একটি বহির্ভূত সমবায় গড়ে তুলবে এবং নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তাদের সম্পদ আদানপ্রদান করবে। অতীতে গ্রন্থাগার ছিল কোনো নিজস্ব সংগ্রহে পৌঁছানোর এক প্রবেশ পথ। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ সে হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানকে অবলোকন করার এক জানালা।

গ্রন্থাগারিকেরা সাধারণত নিজেদের তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে দেখেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগার যতটা তথ্য সরবরাহকারী, তার থেকে অনেক বেশি মোটা মোটা গ্রন্থের ভাণ্ডার। সে যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারের শেল্ফে রাখা লক্ষ লক্ষ পাতার ভিতর জমে থাকা তথ্যের সিংহভাগই হয়তো আদৌ ব্যবহৃত হয় না। বাণিজ্যিক ভাষায় বলা যেতে পারে লেনদেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সময়ের সাথে সাথে আরও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের কথা মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজও অব্যাহত রয়েছে। পেশাদার মানুষদের মূলত তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রত্যেকটি কাজের দিন তারা তথ্য গ্রহণ করেন, সেগুলি নিয়ে কাজ করেন, তার সাথে মূল্য যুক্ত করেন এবং সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের, উপযুক্ত তথ্যের জোগান দেন। কিন্তু কাজ করতে বা সিদ্ধান্ত নেবার আগে, কয়জন ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, আইনজীবী বা ম্যানেজার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে আসেন ?

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 'অটোমেশনের' পুর্নমুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় জন ডিবোল্ড স্বয়ংক্রিয়তার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে আপনি গতকাল যা করেছিলেন, তা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করলেন। দ্বিতীয় স্তরে আপনি লক্ষ্য করলেন যে এই পরিবর্তন জন্ম দিয়েছে সবথেকে বড় এক পরিবর্তনের। এই পরিবর্তন হল সমাজের রূপান্তর।

নিজস্ব পরিষেবা ও তথ্য পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলিকে নিজেদের মধ্যে ও বাণিজ্যিক মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করা হচ্ছে, চল্লিশ বছর আগে প্রাক্-বৈদ্যুতিন যুগে আন্তঃগ্রন্থাগারিক লেনদেন ও নথি সরবরাহের একমাত্র বা প্রাথমিক উৎস হিসাবে গ্রন্থাগারের যা ভূমিকা ছিল, বিকাশশীল দেশগুলি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তা ক্রমশই অন্যান্য তথ্য-কারবারিদের হাতে চলে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার নিয়ে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও প্রতিযোগিতামূলক কাজকর্মের সূচনা হয়েছিল ষাটের দশকের নতুন প্রযুক্তির উত্থানের সাথে সাথে।

গত চার দশক ধরে গ্রন্থাগারগুলির উপর এইসব শক্তির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা সংক্ষেপে তিনটি শব্দে বলা যায় : স্বশাসন, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা। প্রযুক্তি শুধুমাত্র গ্রন্থাগার এবং তথ্যের পরিবেশকেই পাল্টে দিচ্ছে না, তা রূপান্তর ঘটাচ্ছে আমাদের সমগ্র সমাজের।

১.৯ ভবিষ্যতের ছবি

গ্রন্থাগারের এক বিশেষ দায়িত্ব হল প্রযুক্তির পরিবর্তনকে সমাজের মজ্জায় মজ্জায় এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া, যাতে সে এই কাজগুলি করতে সক্ষম হয় :

(ক) তথ্য পরিষেবাকে আরো বিস্তৃত ও ব্যক্তিমুখী করা

(খ) অন্যান্য গ্রন্থাগার ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতিকে আরো উন্নত করে তোলা ;

(গ) তার অভ্যন্তরীণ কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

তথ্যনির্ভর সমাজে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজন কমপিউটার চালিত তথ্য ব্যবস্থা, তথ্যের বিশ্লেষণ, সেগুলিকে ঘনীভূত ও পুনর্বিন্যাস করা। গ্রন্থাগারকে কোনো জাতীয় নেটওয়ার্কের মূল সংযোগবিন্দু হিসাবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, গ্রন্থাগারের সামাজিক দায়িত্ব এখনকার থেকে অনেক বেড়ে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র মুদ্রিত শব্দের এক স্থানু ভাণ্ডার হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না। গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে সমস্ত রকম শৈলীতে (format) সমস্ত রকম জ্ঞানে নাগাল পাবার জন্য মানুষের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা।

প্রত্যাশিতভাবে যদি আমাদের অবকাশের সময় বেড়ে যেতেই থাকে, তাহলে বাড়বে বিনোদনমূলক পড়ার চাহিদা, বাড়বে গবেষক ও তথ্যসন্ধানী শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বাড়বে স্থানীয় নথিপত্রের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের খুঁজে বের করতে চাওয়া মানুষের সংখ্যা। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও অতি দ্রুত তথ্যের সন্ধানে নেমে পড়বে। মানুষের পড়ার ব্যাপারটি মনে রাখা। বঞ্চিত মানুষদের সাহায্য করার দিকটিও গ্রন্থাগারকে খেয়াল রাখতে হবে। তথ্যের জন্য সেইসব মানুষদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে হবে এবং অন্যান্যদের মতো তাদের বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে।

মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে তথ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে আমরা যতই সফল হই না কেন, আমরা যেন একথা কখনোই বিস্মৃত না হই যে, যতই বিপুল আর সুবিধাজনক হোক, দূরদৃষ্টি ছাড়া তথ্য আসলে অন্ধ। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তথ্যের সূত্র খুঁজে বের করা, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তথ্য অগ্রসর ও পরিবর্তিত হয়, তার উপর আলোকপাত করা। এছাড়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল তথ্যকে আবার মানবিক রূপ দেওয়া, তাঁকে পঙ্গুত্বের নয়, আলোকের উৎসে পরিণত করা। আমরা নিজেরা কোনো বিষয় না বুঝতে পারি, কিন্তু আমরা বিষয়টিকে অন্যান্যদের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দিতে পারি যাতে তারা এটি বুঝতে অক্ষম হয়। প্রযুক্তিবিদ গ্রন্থাগারিক তথ্যকে সবার কাছে এগিয়ে দেবেন, মানবতাবাদী গ্রন্থাগারিক তথ্যকে সমাজের উপকারের জন্য ব্যবহার করতে উপদেশ দেবেন।

১.১০ অনুশীলনী

১. আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২. সামাজিক সম্পদ হিসাবে তথ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. গ্রন্থাগার পরিষেবার উপর নতুন মাধ্যমগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪. তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা পরিবর্তনের কারণ কী ?

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. চক্রবর্তী বি : লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি, কলকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৯৩।

২. ফসকেট ডি জে : পাথওয়েজ ফর কমিউনিকেশন ঃ বুকস্ অ্যান্ড লাইব্রেরিজ ইন দি ইনফরমেশন এজ, লন্ডন, ক্লাইভ বিঙ্গালে, ১৯৮৪।

৩. আইজাক কে এ : লাইব্রেরিজ অ্যান্ড লাইব্রেরিয়ানশিপ : এ বেসিক ইন্ট্রোডাকশন, মাদ্রাজ, এস বিশ্বানাথন প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলির্শাস, ১৯৮৭।

৪. ম্যাকগারী কে জে : চেঞ্জিং কনটেক্সটস অফ ইনফরমেশন : অ্যান ইন্ট্রোডাকটরি অ্যানালিসিস, লন্ডন, ক্লাইভ বিঙ্গালে, ১৯৮৩।